

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

বুলেটিন ৪

২০২৩ এপ্রিল ২৩ রবিবার



১৯৬৬ সনের কলকাতা মানে সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’, তপন সিংহের ‘গল্প হলেও সত্যি’, মৃণাল সেনের চিত্রনাট্যে অজয় করের ‘কাঁচকাটা হীরে’। আর হেমন্তের দুপুরে উত্তরায় ‘শঙ্খাবেলা’ দেখে বেরোনো মধ্যবয়সি লাভাণ্যলতার ঠোঁটে গুনগুন—আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব...।

সেই ’৬৬ সনেই স্পেনে এক তরুণের ছবি বলা চলে নতুন বর্ণমালা নিয়ে হাজির হল। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ ফেরত তিন মধ্যবয়সি পুরুষ এক রোদতপ্ত দিনে প্রচুর মদ ও আড্ডা সহযোগে খরগোশ শিকার করছে, এই হল বিষয়। ছবির নাম ‘লা কাজা’, ইংরেজিতে ‘দ্য হান্ট’ (প্রথমে নাম ছিল ‘দ্য র‍্যাবিট হান্ট’, কিন্তু পরে মধ্যের শব্দটি বাদ দিতে হয় স্প্যানিশে অঙ্গীল-কথায় সেটি স্ত্রী-যৌনাঙ্গবাচক হওয়ায়)।

সেবার বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য রুপোর ভালুক পান ছবির তরুণ পরিচালক কার্লোস সাউরা। সেরা ছবির দৌড়ে ছিল জঁ লুক গোদার-এর ‘ম্যাসকুলিন-ফেমিনিন’। সেই উৎসবেই স্পেশ্যাল জুরি অ্যাওয়ার্ড ও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ অব ক্রিটিকস পায় ‘নায়ক’।

এখন বিশ্বের তাবড় চলচ্চিত্র চর্চাকারেরা ‘লা কাজা’ ছবিটিকে ‘স্প্যানিশ নিউ সিনেমা’-র বা স্পেনীয় নব্য ছবির অন্যতম হিসেবে গণ্য করেন। যদিও কার্লোসের সেটা

তৃতীয় কাহিনিচিত্র। অন্তত খান তিন তথ্যচিত্রের পর ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাহিনিচিত্র। অর্থাৎ যে-বছর মুগাল সেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ করলেন আর ঋত্বিক ঘটক করলেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’। স্পেনীয় তরুণের ডেবিউ ছবি ‘দ্য আরচিনস’ (লস গলফস) কানে হইচই ফেলে দিল। সেরা সম্মান পাম ডি’অরের দৌড়ে ছিল সে-ছবি, যদিও পুরস্কার জোটেনি।

কিন্তু সে-বছর কানে গিয়ে কার্লোস যা পেয়েছিলেন, তা কিছু কম নয়—অগ্রজ পরিচালক লুই বুনুয়েল-এর দেখা। আমেরিকা হয়ে বুনুয়েল তখন মেক্সিকোয় বাসা নিয়েছেন। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শেষে জেনারেল ফ্রান্সো ক্ষমতায় এলে তিনি আর দেশে ফিরতে পারেননি। পাবলো পিকাসো আগেই দেশ ছেড়েছেন। কার্লোস যখন মোটে ছ-বছরের, ১৯৩৮ সালে গুলি করে মারা হয়েছে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা-কে।

বুনুয়েলকে সামনে পেয়ে কার্লোস প্রায় মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন কেন তাঁর দেশে ফিরে ছবি করা দরকার। তাতে কাজও হয়। বুনুয়েল স্পেনে ফিরে তৈরি করেন ‘ভিরিদিয়ানা’। এরপর তিনি ফের মেক্সিকোয় ফিরে যান ঠিকই, কিন্তু কার্লোসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে যায় আজীবন। কার্লোসের দ্বিতীয় ছবি ‘ল্যামেন্ট ফর আ ব্যান্ডিট’ ছবিতে বুনুয়েল অভিনয়ও করেন।

’৬৬-র বার্লিনে কার্লোসের দেখা হয় চার্লি চ্যাপলিন-এর মেয়ে জেরাল্ডিন চ্যাপলিন-এর সঙ্গেও। তাঁরা প্রেমে পড়েন দ্রুত এবং আগে-পরে তিনটি বিয়ে সত্ত্বেও ’৭৯ সাল পর্যন্ত টেকা এই সম্পর্ক সম্ভবত দু-জনের জীবনেই সবচেয়ে অর্থবহ, সবচেয়ে ফলপ্রসূ সম্পর্ক। কার্লোসের কথায়, ‘আমার কাজে, এবং জীবনে, জেরাল্ডিনের প্রবেশ মেয়েদের প্রতি আমার দৃষ্টিটাই পালটে দিয়েছে।’ এই পর্যায়ে তাঁর একের পর এক ছবিতে নায়িকা জেরাল্ডিন। যার শুরু পরের বছরই কার্লোসের প্রথম রঙিন ছবি ‘পিপারমিন্ট ফ্রাপে’ দিয়ে।

সেই ছবিও ১৯৬৮-র কান ফেস্টিভালে দেখানোর কথা। কিন্তু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। ফ্রান্সের ‘মে অব ৬৮’ ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গোদার-এরফোরা ফেস্টিভাল থেকে সরে দাঁড়ালেন। ‘পিপারমিন্ট ফ্রাপে’ শুরু হতে যাচ্ছে, পরিচালক আর নায়িকাও লাফিয়ে স্টেজে উঠে পড়লেন। চাঁচিয়ে বলতে থাকলেন, প্রোজেক্টর চালাবেন না! আমরা ছবি দেখাতে চাই না! ফেস্টিভাল বন্ধ হোক! কার্লোস আর জেরাল্ডিন রীতিমতো পর্দা ধরে ঝুলছেন, যাতে পর্দা না সরে। জুরি এসে হস্তদস্ত হয়ে পর্দা খোলার নির্দেশ দিচ্ছেন। ততক্ষণে মঞ্চে এসে গিয়েছেন গোদার আর এরফো! ফেস্টিভাল সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল। দিনটা ছিল ১৮ মে ১৯৬৮।

গোদারদের প্রতি কার্লোসের এই ‘কমরেডশিপ’ কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ফরাসি নবতরঙ্গের পাশপাশিই তিনি বেড়ে উঠছিলেন। ১৯৫৯ সালে গোদারের প্রথম ছবি ‘ব্রেথলেস’ মুক্তি পায় আর ১৯৬০ সালে কার্লোসের ‘লস গলফস’। সেই ছবির সাবটাইটেল করার কাজে প্যারিস গিয়ে কার্লোস ‘ব্রেথলেস’ দেখে আসেন। দুই দেশে নতুন ধারার ছবির চাষ হচ্ছিল প্রায় একই তালে, একই সময়ে।



জেরাল্ডিন চ্যাপলিন ও কার্লোস সাউরা

তবে গোড়ার দিকে একটা সময়ে কিন্তু কার্লোসকে নিওরিয়ালিস্ট বলে মনে করা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। বিশেষ করে সমাজের নীচতলা থেকে তিনি যেভাবে তাঁর বিষয় বেছে নিচ্ছিলেন। ‘লা কাজা’ তো আবার অবধারিতভাবে জঁ রেনোয়া-র ‘রুলস অব দ্য গেম’-এর (১৯৩৯) শিকারদৃশ্য মনে করাবে। কিন্তু একটু এগোলেই বোঝা যাবে, এ-ছবির চলন আলাদা। বিশেষ করে লুই কুয়াদ্রাদো-র ক্যামেরা। সেই কুয়াদ্রাদো যিনি পরে, ১৯৭৩ সালে ভিক্টর এরিস-এর ‘দ্য স্পিরিট অব দ্য বিহাইন্ড’ ছবির জন্য সমধিক পরিচিতি পাবেন।

শুধু শুরুতে নয়, এই ‘নীচতলা’ পরেও কার্লোসের নানা ছবিতে ঘুরে-ফিরে এসেছে। দু-দশক পরে, ১৯৮০ সালে ‘দেপ্রিসা, দেপ্রিসা’ (হারি, হারি) ছবিতেও আমরা তো তাদেরই দেখি। কিন্তু কার্লোস বলছেন, ‘সেসময়ে আমরা বরং ফরাসি নবতরঙ্গের প্রতি অনেকখানি নৈকট্য অনুভব করেছিলাম। এবং আমি, বিশেষ করে বুনুয়েলের প্রতি।’ বুনুয়েল তাঁর কাছে কতখানি তার প্রমাণ জীবনের শেষ ল্যাপে করা দীর্ঘ তথ্যচিত্র ‘বুনুয়েল অ্যান্ড দ্য কিং সলোমন’স টেবিল’, যা দর্শকেরা সেভাবে না-নিলেও কার্লোসের মতে তাঁর জীবনের সেরা কাজ।

গোড়া থেকেই একটা জিনিস কার্লোসের ছবির স্টাইলকে প্রভাবিত করেছে। তা হল সেন্সরের রাঙা চোখ। ফ্রান্সো জমানায় সেই সেন্সর শুরু হত চিত্রনাট্যের পর্ব থেকেই। সেই নজরকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রতীকের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে তাঁর ছবিতে। সেইসঙ্গে এসেছে গল্পকে নানা অ-সরল চলনে ভেঙে ফেলার কৌশল।

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের মধ্যে বেড়ে-ওঠা কার্লোস সেইসময়ের স্মৃতি মাথা থেকে মুছে ফেলতে পারেননি কোনোদিনই। সে-ও প্রবলভাবে ফিরেছে তাঁর ছবিতে। যেমন ‘লা প্রিমা অ্যাঞ্জেলিকা’ (কাজিন অ্যাঞ্জেলিকা, ১৯৭৩) ছবিতে লুই ফিরে যায় নিজের গ্রামে, নিজের ছোটোবেলায় হারানো তুতো-বোন অ্যাঞ্জেলিকার কাছে। কিন্তু চেহারায় সে বড়োসড়ো একটা টেকো লোকই থেকে যায়, সেই খাঁচা থেকে সে বেরোতে পারে না।

আর এইভাবেই ক্রমশ তৈরি হয়ে ওঠে কার্লোস সাউরার নিজস্ব চিত্রভাষা। পরবর্তী সময়ে যার মধ্যে বাগ্ম্যানের বহুস্তরীয় নাট্যভাষার ছায়াও লক্ষ্য করবেন কেউ কেউ।

কার্লোসের প্রথম প্রেম কিন্তু ছিল স্টিল ক্যামেরা। অতি তরুণ বয়সে ছবির প্রদর্শনী করে মাদ্রিদে বেশ নামডাকও হয়েছিল। সারা জীবনে স্থিরচিত্রের প্রতি এই আকর্ষণ তাঁর টসকায়নি। সেটে, হাটে-ঘাটে, রাস্তায় কত ছবি যে তুলেছেন জীবনভর, কত প্রজন্মের কত মডেলের ক্যামেরা যে ছিল তাঁর সংগ্রহে! কিন্তু শুরুর সেই সময়টা ছিল বেশ নড়বড়ে। অন্ধ আর আঁকায় পারঙ্গম ছিলেন বলে স্কুল পাশ করার পর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভরতি হয়ে যান। তাঁর নিজের জবানে, ‘তখন আমি আসলে হতে চাইতাম বাইক-রেসার বা ফ্ল্যামেস্কো ডান্সার’ আন্দালুসীয় নাচ ‘ফ্ল্যামেস্কো’ বস্তুত ন্যাশনালিস্ট ফ্রান্স্কোর আমলেই জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে সামনের সারিতে উঠে এসেছিল।

১৯৫২ সালে দাদা আন্তোনিও-র উপরোধে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফিল্ম স্কুলে ঢোকে কার্লোস। সেই বছরেই একটা ১৬ মিমি ক্যামেরা কিনে তিনি ঠিক করে ফেলেন, মাদ্রিদে সান ইসিদ্রো-র কাছে বার্ষিক তীর্থযাত্রার তথ্যচিত্র করবেন, তাতে যুক্ত করবেন ফ্রান্সিসকো গোইয়া-র চিত্রকলাও। কারণ স্পেনের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী গোইয়া এই তীর্থযাত্রার ছবি ঐকে রেখেছিলেন তাঁর নিবাস ‘বধির ভবন’-এর (হাউস অব দ্য ডিফ) দেওয়ালে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেঙে যায়।

বছর তিনেক পরে কার্লোস জীবনের প্রথম চলচ্ছবি বানান, আট মিনিটের একটা তথ্যচিত্র, যার নাম ছিল ‘ফ্ল্যামেস্কো’ অথবা ‘আন্তোনিও সাউরা’ (দাদার নামে, তিনিই ওই ছবির অভিনেতা)। পরিণত বয়সে কার্লোস ফিরলেন সেই ফ্ল্যামেস্কোতেই। ১৯৮১ সালে মুক্তি পেল লোরকার নাটক থেকে ছবি ‘দ্য ব্লাড ওয়েডিং’। ফ্ল্যামেস্কোর ছন্দেই তিনি গড়ে তুললেন এই মিউজিকাল। দু-বছর বাদে এল, দ্বিতীয় মিউজিকাল ‘কারমেন’, যা নাকি কার্লোসের জীবনে আন্তর্জাতিকভাবে সফলতম ছবি। প্রসপার মেরিম-এর নভেল আর জর্জ বিজে-র অপেরা মিলিয়ে-মিশিয়ে ফ্ল্যামেস্কোতেই এনে ফেললেন কার্লোস। ১৯৮৬-তে এল ফ্ল্যামেস্কো ট্রিলজির শেষ ছবি, ‘লভ, দ্য ম্যাজিশিয়ান’।

এরপর মিউজিকাল থেকে কিছুদিনের ছুটি। কার্লোস আবার সংগীতে এলেন ১৯৯৫ সালে। এবার তথ্যচিত্র ‘ফ্ল্যামেস্কো’। তিন বছর বাদে ‘ট্যাঙ্গো’ (১৯৯৮), ততদিনে কার্লোসের সঙ্গী হয়েছেন বিখ্যাত ইটালিয়ান সিনেমাটোগ্রাফার ভিক্টোরিও স্তোরারো। মিউজিক, রং, নাচ সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য বর্ণাঢ্য চিত্রভাষার জন্ম হল।

সেই ভাষার সরণি বেয়েই ফিরলেন ফ্রান্সিসকো গোইয়া-ও। নৃত্যের বিপুল ছন্দই যেন শিখালগ্ন গলন্ত মোমের স্থিরতায় ঝুল প্রবল শক্তির এক চিত্রকর আর তাঁর ক্যানভাসকে।

এ-কথা নিশ্চিত যে সন্তুর পার-করা কার্লোসের ছবির শেষ পর্ব জুড়ে সংগীতেরই বিস্তার। কখনো ‘সালোমে’ (২০০২), কখনো ‘আইবেরিয়া’ (২০০৫), কখনো ‘ফাদো’ (২০০৭)...। কখনো ফের ‘ফ্ল্যামেস্কো, ফ্ল্যামেস্কো’ (২০১০)। সামান্য গল্প সামনে রেখে, অধিকাংশ সময়েই না রেখে প্রায় তথ্যচিত্রের চলনে চলা প্রতিটি ছবি।

এরই মধ্যে এক যতিতে থমকে দাঁড়িয়ে যেন কার্লোস ঝুলেন স্পেনের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক আইকনকে। নানা শিল্পমাধ্যমকে এক জায়গায় এনে যেন এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান মজলেন তিনি। ‘গোইয়া ইন বোর্ডো’ (১৯৯৯) ছবিতে তিনি ধরলেন চিত্রকরের জীবনের শেষ চারটি বছর। যখন তিনি বিপুল প্রতিষ্ঠিত, কিছুটা স্থলিত, অনেকটা আর্ত। একা নন ঠিক, তবু ভীষণ একা। রঙের প্রবল আড়ালনে, বিস্ফারে হয়তো তারই জানান।

এরপর, ২০২১ পর্যন্ত তিনি আরও চারটি কাহিনিচিত্র করেছেন ঠিকই, কিন্তু ঘনত্বে-তীব্রতায় কোনোটিই আর গোইয়ার ধারে-কাছে আসেনি।

ফ্রান্সিসকো গোইয়া (১৭৪৬–১৮২৮)

স্পেনীয় চিত্রশিল্পী। তৈলচিত্র ছাড়াও তক্ষণচিত্র ও ছাপাই ছবির ক্ষেত্রেও বহু উল্লেখযোগ্য কর্মের জনক। বহন করেছেন আরেক প্রখ্যাত স্পেনীয় শিল্পী দিয়েগো ভেলাসকেজ-এর (১৫৯৯–১৬৬০) উত্তরাধিকার। ধ্রুপদি যুগের ঘরানায় সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের কৃতকর্মেই আধুনিক মানসের অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। উনিশ এবং বিশ শতকের একাধিক শিল্পীর উত্থানে তাঁর ছবির অনুপ্রাণনা যথেষ্ট স্বীকৃত। যুগসন্ধিক্ষণের শিল্পী হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করে তাই সাবেক কালের শেষ দিকপাল আর আধুনিক যুগের হোতার আসনে বসানো হয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন।



আত্মপ্রতিকৃতি: ফ্রান্সিসকো গোইয়া

স্বদেশি শিল্পশিক্ষকের তত্ত্বাবধান ছাড়াও ইতালিতে শিক্ষানবিশি করেছেন। রাজহুয়ের নীচে শিল্পজীবিতার সূচনা মোটামুটি বছর উনতিরিশ-তিরিশে। রাজপরিবারের লোকজন ছাড়াও সামাজিক পরিচয়ে উচ্চকোটির নারী-পুরুষ অনেকেই বিভিন্ন সময়ে তাঁর সামনে ‘পোজ’ দিয়েছেন। যার দরুন তাঁর প্রতিকৃতিচিত্রও বহুল হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের চিত্রাবলিও। উপাসনালয়ের দেওয়াল ও ছাদে সেসব ভিত্তিচিত্র প্রথমদিকে মূলত বরাতপ্রাপ্তির সুযোগে নির্মিত এবং পরে রাজসংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে ওঠার পরিণামেও কিছুটা। এসবের বাইরে আঞ্চলিক জনজীবনের ছবিও বিস্তার—নিজের সময়েরই স্মারক সেসব, বৈচিত্র্য অন্তহীন। আছে

উন্মাদাগারের মানুষজনকে নিয়েও স্বতন্ত্র অনুভবের প্রকাশ। এমনকী নেপোলিয়নের পদানত স্বদেশের দুর্ভোগ—ত্রস্ত সাধারণ নরনারীর হিংসার বহিঃপ্রকাশ, বিদেশি সৈনিকের হাতে যাজকের হত্যা, কিংবা প্রতিবাদীনিধনের বীভৎসতাও। রাজানুগ্রহ সত্ত্বেও

নীরবে চিত্রিত করেছেন নিজের সাম্প্রতিককে, কখনো সরাসরি, কখনো-বা হেঁয়ালির আশ্রয়ে ব্যঙ্গের রকমফেরে। অথচ বছর সাতচল্লিশ বয়েসে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে শ্রুতির ক্ষমতা হারান। তখন অন্য অনুভূতি, জনজীবন থেকে ধীরে ধীরে নিরালায় সরিয়ে নিতে থাকেন নিজেকে। স্বদেশের শোচনীয় অবস্থাও ক্রমে বিবিক্ত করে তোলে। ক্ষয়িষ্ণু শরীর নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন আটাত্তর বছরে (১৮২৪)। আরও অনেক স্পেনীয়র মতোই এসে ওঠেন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম বন্দর শহর বোর্ডো-য়। বিপত্তীক সেখানেই তাঁর পূর্বপরিচিত লিওকাডিয়া ওয়াইস আর তাঁর বালিকা কন্যা রোজারিও-র সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন বিরাশি বছর বয়েসে। তাঁর জীবনভিত্তিক একাধিক উপন্যাস ছাড়াও বেশ কয়েকটি তথ্য এবং কাহিনিচিত্রও রয়েছে।

২২

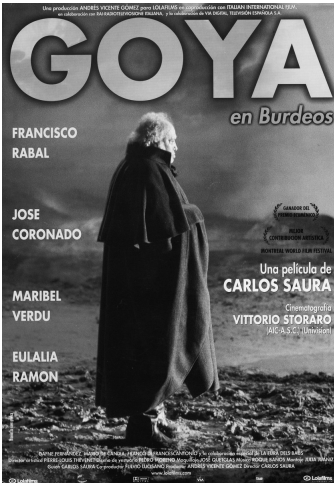
Tribute to the Masters

Satyajit Ray | Carlos Saura
2 May 1921–23 April 1992 | 4 January 1932–10 February 2023

*Painters in the eyes
of the filmmakers*

২৩

Discussion on *The Inner Eye* (1972),
Satyajit Ray's short documentary on
Benode Behari Mukherjee @ 5 pm



Discussion on Carlos Saura's work
vis-a-vis Francisco Goya @ 5.45 pm

Goya in Bordeaux

Goya en Burdeos

[1999 / Spain / Col / 105 mins]

Direction: Carlos Saura

Script: Carlos Saura

Starring: Francisco Rabal,
Maribel Verdú, José Coronado

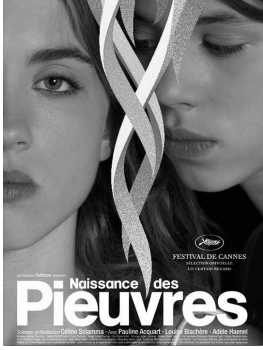
Cinematography: Vittorio Storaro

Editing: Julia Juaniz

Music: Roque Baños

Screening @ 6.30 pm

এই ছবি হয়তো আমার মেয়ের জয়িতা চট্টোপাধ্যায়



দুটো মেয়ের কথার বুড়ি দিয়ে বোনা একটা গল্প ‘ওয়াটার লিলিজ’। একদম আমাদের সময়ের মেয়েদের সমস্যা বা স্বপ্ন বা কথোপকথনের সংলাপ হয়তো এটা নয়। কারণ আমি কৈশোরের পেরিয়েছি, তারুণ্যের রঙিন দিনগুলোতে পৌঁছেছি ৯০ দশকের মাঝামাঝি। কিন্তু সম্পর্কের বোঝাপড়ায় মিল পাচ্ছি—কখনো বিরক্ত, কখনো হলায়-গলায় ভাব।

এই ছবি হয়তো আমার মেয়ের—যারা একটুতেই ‘বোর’ হয়ে যায়, বিরক্ত হয়। সব মাধ্যমকেই তারা জেতা-হারা দিয়ে মাপে। ওদের হয়তো ভালো লাগাটাই শেষ কথা। মনের মিল খুঁজতে গিয়ে হয়তো লিঙ্গভেদও মনে থাকে না অনেক সময়ে। এক মুহূর্তকে এতটাই বড়ো ভাবে যে সেটাকেই সারা জীবন ভেবে বসে।

সত্যি বলতে, আমরাও ভাবতাম। কিন্তু বড্ড গণ্ডি থাকত সব ভাবনার পরে। এ-রকম তো ভালো লাগছে, এরপর কী? ভাবতে পারতাম না। আমার মনে হয়, এখনকার ছোটোরা কিন্তু অনেক স্থির। তবুও টানাপড়েনে পড়ে তারাও। বিশেষত আবেগ যখন বাঁধনছাড়া। কোন বন্ধুত্বকে বেশি গুরুত্ব দেবে সেটা ভেবে, হয়তো পায় না। শরীর গুরুত্ব পায়, ভাবায়। স্বাভাবিক যে সবাই তা বোঝে, তা হয়তো নয়, কিন্তু কুঁকড়েও যায় না আমাদের মতো। তবে এ-ও ঠিক যে আমাদের চেয়ে ওদের একাকিত্ব অনেক বেশি। ওদের মানসিক দৃঢ়তাই হয়তো ওদের একা হওয়ার পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

এই ছবিতে আমার ভালো লেগেছে সহজ সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে, আবেগকে কষ্ট না দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। আবার নিজেকে নিকৃষ্ট না হতে দিয়ে ঠিক সময়ে ফিরে আসা। আর সরল একটা বন্ধুত্ব যাতে সব কিছুর পরেও হালকা থাকা যায়।

পদ্ম সুন্দর, কিন্তু হাওয়ায় দোলে বড্ড বেশি। শালুক ফুটে থাকে সোজা হয়ে তার রঙের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। জানি না কী ভেবে পরিচালক এই ছবির নাম দিয়েছেন। ওঁদের দেশ-কাল মানসিকতা তো পুরোপুরি আমাদের সঙ্গে মেলে না। চোদ্দো বছরের ওই মেয়েটিকে হয়তো আমাদের দেশে আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া শক্ত। আবার, চোদ্দো বছরে কিন্তু এ-দেশে মেয়েদের বিয়েও হয়ে যায়।

Water Lilies, Céline Sciamma, ১৯ মার্চ ২০২৩ ক্লাবে দেখানো হয়

ফের একটি বছর শুরু। পুরোনোরা সভ্যপদ পুনর্নবীকরণ করান। নতুনোরা সভ্যপদ নিন।

Coming in terms with oneself

Ankita Pal

It is hard not to notice that Céline Sciamma has portrayed her female characters who express themselves in private spaces where they can share their loneliness, their hopes and their feelings.

The 'Water Lilies' is set during a sultry summer holiday in Paris when Marie who visits synchronized swimming team is bewitched by the beautiful captain Floraine. Her friendship with Anne makes them a pair of misfits who scramble through the steps of growing up. Marie exhibits classic feelings of attraction for Floraine which is evident from the way she is hanging from every word and every action of Floraine. Marie's obsession was made obvious when she took a bite from the half-eaten apple that she stole from Floraine's trash can. Floraine on the other hand looks every bit glamorous and aware of the power her beauty beholds but, her actions, her indecisiveness is fascinating to explore. She's clearly aware of the feelings Marie harbors for her which she exploits from the very beginning.

There can be no severe judgment for Floraine on this note as she seems bewildered as to what she exactly wants, the feelings that Marie seems to awaken, or her natural inclination towards men, solely to be the subject of their attraction. Just like any other teenager she's insecure about her sexual inexperience, which might put a dent on her image, she would rather use Marie to overcome it.

When it comes to Anne, she's a 15 year old teenager, barely in terms with the boundaries society has set upon women's body types. She seeks the attention of François is clearly besotted with Floraine, but upon her rejection uses Anne as his physical release. As a consequence she spits in his mouth.

This movie was about growing up, accepting your sexuality and coming in terms with oneself and enduring the pain of both requited and unrequited love. Sciamma has shown the glimpses of intimacy and layers of emotion that enfolds the womankind that could only be captured through the lens of a woman herself. None else.